ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসনঃ চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

(সার-সংক্ষেপ)

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মো. শাহ্নূর রহমান
নাজমুল হুদা মিনা

জানুয়ারি ২০১৫

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসনঃ চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ার, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি

এম. হাফিজউদ্দীন খান
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

গবেষণা তত্ত্বাবধান

মো. ওয়াহিদ আলম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. শাহ্নূর রহমান
প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

নাজমুল হুদা মিনা
অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

গবেষণা সহযোগী

মো. সামিউর রহমান
গবেষণা সহকারি (প্রাক্তন) -রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট অংশিজন- বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি এবং বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতির সদস্যবৃন্দ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মূল্যবান মতামত এই গবেষণা প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও মূল্যবান মতামত প্রদানে টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ওয়াহিদ আলম এবং শাহজাদা এম আকরামের প্রতি কৃতজ্ঞতা। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে গবেষণা ও অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীরা মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি নং ০৫, সড়ক নং ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২ ফ্যাক্স: ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org, ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন টিআইবির গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে প্রাধান্যপ্রাপ্ত ক্ষেত্র সমূহের অন্যতম। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়।

ওষুধ খাতে বিগত বছরগুলোতে রপ্তানি বৃদ্ধিসহ আমাদের দেশীয় চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভেজাল ও নকল ওষুধ নিয়ন্ত্রণে সাম্প্রতিককালে সরকারিভাবে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন, মাঠ পর্যায়ে জনবল বৃদ্ধি, ওষুধ পরীক্ষাগার পুনঃস্থাপন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভেজাল ও নকল ওষুধ প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে অভিযান জোরদারকরণসহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে এ সকল পদক্ষেপ সত্ত্বেও ওষুধ বাজার নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে সুশাসনের ঘাটতি লক্ষণীয়। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতা এ খাতের ব্যাপক কর্মপরিধি, ভৌগলিক আওতা এবং ওষুধের বাজারের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ওষুধ নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইনি কাঠামো সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ট নয় এবং এ ক্ষেত্রে আইনের কার্যকর প্রয়োগেরও ঘাটতি বিদ্যমান। এছাড়া ওষুধ বাজার নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে । অপরদিকে অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সময়ে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার ঘাটতিও লক্ষ্য করা যায়। এসকল সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কারণে ওষুধের বাজার তদারকি ও পরিবীক্ষণে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয় যা সাধারণ নাগরিকের স্বাস্থ্য ও জীবনের নিরাপত্তায় হুমকি সৃষ্টি করছে।

গবেষণার খসড়া প্রতিবেদনটি ১৪ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অধিদপ্তরের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। তাঁদের মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধতর হয়েছে। অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ ধরনের সহযোগিতার জন্য তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া সংশ্লিষ্ট যেসকল অংশীজন তথ্য উপাত্ত দিয়ে গবেষণাটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মো. শাহ্নূর রহমান ও নাজমুল হুদা মিনা। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও অন্যান্য ট্রাস্টিগণ এই গবেষণা সম্পন্ন করতে মূল্যবান অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। টিআইবি আশা করে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ বাংলাদেশে নিরাপদ ও মানসম্মত ওষুধ নিশ্চিতকরণে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করে তুলতে সাহায্য করবে। সর্বোপরি এ অধিদপ্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের ওষুধ খাত তথা স্বাস্থ্য খাতে অর্জন আরো বাড়ানো সম্ভব হবে।

এ প্রতিবেদনের যে কোনো বিষয়ে পাঠকের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসন: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ[১]

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

ওষুধ জীবন রক্ষার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে বিবেচিত। ওষুধ নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। ওষুধ শিল্প সংবেদনশীল হওয়ায় বিশ্বব্যাপি এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হচ্ছে 'ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর'। এ অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রয়সাধ্যমূল্যে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং দেশে ওষুধের উৎপাদনসহ আমদানীকৃত ও রপ্তানিযোগ্য ওষুধের গুণগত মান ও কার্যকরতা নিশ্চিত করা।

বর্তমানে আমাদের দেশিয় চাহিদার ৯৭ শতাংশ ওষুধ দেশিয় কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদন হচ্ছে। তৈরি পোশাক খাতের পরবর্তী সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ওষুধ শিল্পকে বিবেচনা করা হয় যার গড় প্রবৃদ্ধির হার ২১.৩৯ শতাংশ। ওষুধ খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও মান সম্মত উৎপাদন ও ওষুধের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ওষুধ খাতের নিয়ন্ত্রক এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকারিভাবে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মাঠ পর্যায়ে জনবল বৃদ্ধি, ওষুধ পরীক্ষাগার পুনঃস্থাপন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ, যা এখনও চলমান রয়েছে। এছাড়া ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ভেজাল ও নকল ওষুধ প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে অভিযান জোরদারকরণসহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০১৩ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অধিদপ্তরে একটি নৈতিকতা কমিটি গঠন এবং সেবাদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিম গঠন উল্লেখযোগ্য।

ওষুধ খাতে উপরোক্ত সম্ভাবনা ও উদ্যোগ সত্ত্বেও কিছু সমস্যা ও অনিয়ম লক্ষণীয়। কিছুসংখ্যক কোম্পানি মানসম্মত ওষুধ উৎপাদন করলেও বেশকিছু কোম্পানির বিরুদ্ধে নকল, ভেজাল, নিম্নমান ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি এবং গুড ম্যানুফেকচারিং প্রাকটিস (জিএমপি) অনুসরণ না করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ওষুধের বাজার সম্পর্কে কিছু সাধারণ অভিযোগও রয়েছে। এগুলো হলো ওষুধ শিল্পের দুর্বল তদারকি এবং পরিবীক্ষণ, ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণে তদারকির অভাব, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের ক্রয়-বিক্রয় এবং অবৈধ ড্রাগ স্টোরের বিস্তার উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময়ে ভেজাল, মেয়াদোত্তীর্ণ ও নিম্নমানের ওষুধ নিয়ন্ত্রণে ওষুধ প্রশাসনের দুর্বল তদারকি এবং ব্যবস্থাপনাগত ঘাটতির কারণে জনস্বাস্থ্য হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৮০-২০১৩ সাল পর্যন্ত ভেজাল প্যারাসিটামল ওষুধ সেবনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশুর মৃত্যুর ঘটনা লক্ষণীয়। ভেজাল ও নকল ওষুধ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সময়ে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং এ লক্ষ্যে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও নকল, নিম্নমান ও ভেজাল ওষুধের উৎপাদন অব্যাহত থাকে। ওষুধ নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে গণমাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হলেও এ প্রতিষ্ঠানের সুশাসনের ওপর কাঠামোবদ্ধ গবেষণার অপর্যাপ্ততা রয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি জনগুরুত্বপূর্ণ যে খাতগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে থাকে স্বাস্থ্যখাত তার অন্যতম। ওষুধ খাত যেহেতু স্বাস্থ্যখাতেরই একটি অপরিহার্য অংশ তাই উপরিল্লিখিত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) 'ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসন: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এ গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। এছাড়াও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- ওষুধের উৎপাদন, বাজার নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতি ও আইন পর্যালোচনা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ করা
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও ক্ষেত্র তুলে ধরা

[১] ২০১৫ সালের ১৫ জানুয়ারি ঢাকার ধানমন্ডিস্থ মাইডাস সেন্টারে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও তদারকি ব্যবস্থাপনাকে উন্নতকরণ এবং দুর্নীতি ও অনিয়মরোধে সুপারিশ প্রণয়ন করা

এ গবেষণায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাধীন পাঁচ শ্রেণির ওষুধ কোম্পানির মধ্যে (অ্যালোপ্যাথি, ইউনানি, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি ও হারবাল) অ্যালোপ্যাথি ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি গবেষণার আওতাভুক্ত। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুশাসন আলোচনার ক্ষেত্রে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের (আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সংবেদনশীলতা, সেবার ঘাটতি ও দুর্নীতি) ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সব অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এটি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে চলমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, কেস স্টাডি এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের উৎসগুলো হল- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা (কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে); ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সদস্য, ওষুধ কোম্পানির মালিক ও কর্মকর্তা (রেগুলেটরি); ওষুধের দোকানের মালিক; বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল (বিপিসি), বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি (বিপিএস), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাসট্রিজ (বিএপিআই) ও বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতি (বিসিডিএস) এর প্রতিনিধি; পুলিশ কর্মকর্তা, চিকিৎসক, ওষুধখাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ, দাপ্তরিত নথি এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রমটি মার্চ ২০১৪ - জানুয়ারি ২০১৫ সময়ের মধ্যে পরিচালিত হয়।

গবেষণার ফলাফল

২. ওষুধ প্রশাসনের আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে ওষুধ খাতের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে ওষুধ আইন, ১৯৪০; ড্রাগ রুলস, ১৯৪৫ ও বেঙ্গল ড্রাগ রুলস, ১৯৪৬; জাতীয় ওষুধ নীতি, ২০০৫ এবং ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ দ্বারা পরিচালিত হয়। এ সকল আইন, বিধি ও নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিম্নে ওষুধ নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান নীতি ও আইনসমূহের সীমাবদ্ধতা এবং প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ আলোচনা করা হল।

২.১ সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ঠ নয়

ওষুধ আইন, ১৯৪০ ও ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ঠ নয়। এ দু'টি আইনে মানবস্বাস্থ্যের জন্য সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ- মেডিকেল ডিভাইস, ফুড সাপ্লিমেন্ট ও কসমেটিক সামগ্রী অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। এ বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে আইনিভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই এবং এসকল কাজ ওষুধ প্রশাসনের কাজের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। এর ফলে কেউ নিম্নমানের ও ঝুঁকিপূর্ণ মেডিকেল ডিভাইস, ফুড সাপ্লিমেন্ট ও কসমেটিকস সামগ্রী উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাত করলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়না।

অপরদিকে 'জাতীয় ওষুধ নীতি, ২০০৫' এ ওষুধ প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পরিদপ্তর হতে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ, অবকাঠামোগত সূযোগ-সূবিধা এবং কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বেশকিছু বিষয়ে দিক নির্দেশনা ও গুরুত্বারোপ করা হলেও এ নীতির কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। এ নীতিতে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা হালনাগাদ ও অন্যান্য ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রনে নির্দেশনার অস্পষ্টতা রয়েছে। এছাড়া দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ প্রস্তুতে প্রণোদনার ক্ষেত্রে নীতিগত নির্দেশনারও ঘাটতি লক্ষণীয়। এ নীতিতে আমদানিকারকদের চাহিদা অনুযায়ী যেকোনো ওষুধ উৎপাদনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও হালনাগাদকরণ এবং অন্যান্য ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পদক্ষেপের ঘাটতিসহ অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ উৎপাদনে কোম্পানিগুলোর অনাগ্রহ বৃদ্ধির ঝুঁকিও লক্ষণীয়। আবার এ নীতিতে আমদানিকৃত ওষুধ নিবন্ধনের জন্য বায়োঅ্যাভেইলেবিলিটি ও বায়োইক্যুইভ্যালেন্স তথ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা হলেও বায়োলজিক্যাল ওষুধের অত্যাবশ্যকীয় ক্লিনিক্যাল ট্রায়েল উল্লেখ করা হয়নি, এর ফলে দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী ওষুধের আমদানির ঝুঁকি সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

২.২ ওষুধ সংক্রান্ত কমিটিগুলোর গঠন ও কর্মপ্রক্রিয়া উল্লেখ না থাকা

১৯৮২ সালের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশে শুধুমাত্র ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করার কথা উল্লেখ করা হলেও এর গঠন, কর্মপ্রক্রিয়া, সদস্যসংখ্যা ও সদস্যদের যোগ্যতা আইনিভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। এছাড়া অন্যান্য কমিটিগুলোর গঠন, কর্ম প্রক্রিয়া, সদস্যসংখ্যা ও সদস্যদের যোগ্যতা আইনে উল্লেখ না থাকায় কমিটিগুলোতে রাজনৈতিক বিবেচনায় সদস্য নির্বাচন, সদস্যদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং কমিটিগুলোর দায়িত্বপালনে সাংঘর্ষিকতার ঝুঁকি তৈরি সুযোগ সৃষ্টি হয়।

২.৩ কেন্দ্রিয় পরীক্ষাগার স্থাপনের কথা বলা হলেও তার অধীনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বা চাহিদা অনুযায়ী পরীক্ষাগার স্থাপন উল্লেখ না থাকা

ওষুধ আইন, ১৯৪০ এর ধারা ৬ (১) এ ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণে একটি কেন্দ্রিয় পরীক্ষাগার স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। তখনকার প্রেক্ষাপটে একটি কেন্দ্রিয় পরীক্ষাগার দ্বারা ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ বাস্তবসম্মত হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ওষুধ শিল্পের বিস্তার ও উৎপাদনের ব্যাপকতায় একটিমাত্র কেন্দ্রিয় পরীক্ষাগার দ্বারা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অথচ পরবর্তীতে ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২তে স্থানীয় পর্যায়ে পরীক্ষাগার স্থাপনের বাস্তবতাও এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং চাহিদা অনুযায়ী পরীক্ষাগার স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর ফলে আঞ্চলিক পর্যায়ে পরীক্ষাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২.৪ ওষুধের মূল্য নির্ধারণে গেজেট প্রকাশের সময় সুনির্দিষ্ট না থাকা

১৯৮২ সালের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের ধারা ১১ তে সরকার কোনো ওষুধের কাঁচামালের মূল্যের নিরীখে ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য নির্ধারণক্রমে সরকারি গেজেট প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে গেজেট প্রকাশের সময় সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। নিয়মিতভাবে গেজেট প্রকাশ না হওয়ায় উচ্চদামে ওষুধ বিক্রয় করলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য সর্বশেষ ২০০০ সালে ওষুধের মূল্য নির্ধারণে সরকারিভাবে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

২.৫ বিধিমালা তৈরি ও হালনাগাদ না করা

ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮২ সালের ১২ জুন প্রণীত হয়। এ অধ্যাদেশের এখনও পর্যন্ত বিধিমালা তৈরি করা হয়নি। অপরদিকে ওষুধ আইন, ১৯৪০ এর বিধিমালার (ওষুধ বিধিমালা, ১৯৪৫ এবং বেঙ্গল ওষুধ বিধমালা, ১৯৪৬) পরিবর্তীত অবস্থার প্রেক্ষিতে হালনাগাদ করা হয়নি। যেহেতুে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিধিমালা নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে, তাই ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর বিধিমালা তৈরি না হওয়া ও ওষুধ আইন, ১৯৪০ এর বিধিমালা হালনাগাদ না হওয়ায় আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকসময় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে অস্পষ্টতা তৈরি হয়।

২.৭ ওষুধের অযৌক্তিক ও অপব্যবহার রোধে ব্যবস্থাপত্র বিষয়ে উল্লেখ না থাকা

ওষুধের অযৌক্তিক ও অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ওষুধ আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সঠিকভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ওষুধের অযৌক্তিক ব্যবহার রোধ করা সম্ভব। ওষুধ আইন, ১৯৪০ এবং ওষুধ (নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ তে ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ওষুধ বিক্রয়ে ব্যবস্থাপত্র বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি। এর ফলে খুচরা ওষুধ বিক্রেতার ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

২.৮ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ওষুধ তৈরি ও অনুমোদনহীন ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে প্রস্তাব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দণ্ডের উল্লেখ না থাকা

নিম্নমান, ক্ষতিকর অথবা নকল ওষুধ উৎপাদনে ওষুধ আইন, ১৯৪০ ও ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২ তে বিভিন্ন দণ্ডের বিষয় উল্লেখ থাকলেও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে কোন দণ্ডের বিধান উল্লেখ করা হয়নি। অপরদিকে, ওষুধ (নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২'তে চিকিৎসক কর্তৃক অনুমোদনহীন ওষুধ ব্যাবস্থাপত্রে প্রস্তাব করা নিষেধ করা হলেও এ ক্ষেত্রে নিষেধ অমান্য করা হলে কোন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়নি। এর ফলে অনুমোদনহীন ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখ করা হলে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

২.৯ আইনে কঠোর দণ্ডের অভাব এবং শাস্তি ও দণ্ডের পরিমাণে অসামঞ্জস্যতা

ওষুধ আইনে শাস্তি ও জরিমানার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায় অপরাধের মাত্রা ও গুরুত্ব বিবেচনায় কঠোর দণ্ডের অভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- ওষুধ আইন, ১৯৪০ এ অনুমোদনহীন, ভেজাল, নকল ও মিসব্রান্ডেড ওষুধ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিক্রয়ে সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা অনির্দিষ্ট করা হয়েছে। অপরদিকে ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ তে উল্লিখিত অপরাধের ক্ষেত্রে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আবার অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় শাস্তি ও দণ্ডের পরিমাণে অসামঞ্জস্যতা লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ- ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ,

১৯৮২ তে সরকারি ওষুধ চুরির ক্ষেত্রে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ লাখ টাকা জরিমানার বিধান এবং ভেজাল, নকল ও মিসব্রান্ডেড ওষুধ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিক্রয়েও সমপরিমাণ শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। আইনে কঠোর দণ্ডের অভাব এবং শাস্তি ও দণ্ডের পরিমাণে অসামঞ্জস্যতার কারণে একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ও স্থায়ীভাবে অপরাধ দমনে ব্যর্থতা তৈরি হয়।

৩. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

৩.১ অবকাঠামোগত সমস্যা

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান। অধিদপ্তরের কেন্দ্রিয় কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য নিজস্ব কোনো অফিস ভবন নেই। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী কার্যালয়ের অভাব রয়েছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলার তদারকিতে কেন্দ্রিয় কার্যালয়সহ মোট ৫২টি জেলায় অফিস রয়েছে। এর ফলে কার্যালয়বিহীন জেলাগুলোতে তদারকি কার্যক্রম ব্যহত হয়। অপরদিকে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে জায়গার অপ্রতুলতা রয়েছে। পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা যেমন- অফিস ফাইল ও নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, ওষুধের নমুনা সংরক্ষণ ও সেবাগ্রহীতাদের সেবাপ্রদানে সমস্যা হয়।

৩.২ তদারকি ও পরিদর্শনে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ঘাটতি

ওষুধের বাজার পরিবীক্ষণ ও তদারকিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক ও পরিদর্শকদের প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ঘাটতি লক্ষণীয়। সাধারণত কোনো কোম্পানি পরিদর্শনে ওষুধ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির পরিবহন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়। এর ফলে কর্মকর্তা ও কোম্পানির মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরী এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে ওষুধের নমুনা সংগ্রহ ও এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাব রয়েছে। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে কেন্দ্রিয় পরীক্ষাগারে প্রেরণকৃত নমুনার কিছু অংশ পরীক্ষার অনুপযুক্ত হয়।

৩.৩ জনবলের স্বল্পতা ও সমস্যা

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কাজের পরিধি ও ভৌগলিক আওতা বিবেচনায় জনবল স্বল্পতা লক্ষণীয়। দেশের ৬৪টি জেলার প্রতিটিতে কমপক্ষে ১জন করে ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক ও ১জন ওষুধ পরিদর্শক থাকা প্রয়োজন অথচ ঢাকার কেন্দ্রিয় অফিসসহ মাঠপর্যায়ে বর্তমানে ৫৮ জন ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক ও ৪জন ওষুধ পরিদর্শক কর্মরত রয়েছে। অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ার পর প্রায় ৪বছর অতিবাহিত হলেও এখনও পর্যন্ত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সকল পর্যায়ে জনবল নিয়োগ হয়নি। সার্বিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বর্তমানে অনুমোদিত পদের বিপরীতে ৩৮ শতাংশ পদ শুন্য রয়েছে। ২০১১ সালে ঢাকায় পুন:প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারের অর্গানোগ্রাম এখনও পর্যন্ত অনুমোদন হয়নি। পুরানো পরীক্ষাগারের অপ্রতুল জনবল দ্বারা এ পরীক্ষাগারের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অপরদিকে কেন্দ্রিয় ওষুধ পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম এ ২০টি টেকনিক্যাল পদের বিপরীতে মাত্র ৫জন কর্মরত রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় জনবলের স্বল্পতায় ওষুধ প্রশাসন প্রতি বছর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ওষুধের বাজার তদারকি করতে ব্যর্থ হয় এবং ওষুধ পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতির কারনে দেশের বাজারের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক (প্রতিবছর প্রায় ৭০ শতাংশ) ওষুধের মান পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।

৩.৪ কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কেন্দ্রিয় ও মাঠ পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তাসহ ওষুধ পরীক্ষাগারের টেকনিশিয়ানদের পেশাগত জ্ঞান এবং কারিগরি দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে তারা ওষুধের বাজার তদারকি ও মান নিয়ন্ত্রণে কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করতে পারে না। ওষুধ তত্ত্বাবধায়কদের জন্য নিয়মিতভাবে কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে পদসংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনা করা হয় না। নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু না থাকায় তারা ওষুধের বাজারের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ, বিদ্যমান আইনকানুন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন হতে পারে না।

৩.৫ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন প্রস্তুতে দুর্বলতা

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয়। এ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রিয় ও মাঠ পর্যায়ে তথ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও একক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। এর ফলে অধিদপ্তরের প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নথি ব্যবস্থা দুর্বল হয় এবং কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে প্রেরিত প্রতিবেদনের তথ্য ব্যবস্থাপনায় সমস্যা ও অপূর্ণতা থাকে। এছাড়া ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে অধিদপ্তরের সেবা সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি ও সন্নিবেশিত তথ্য হাল নাগাদ না হওয়া লক্ষণীয়। এ কারণে সেবাগ্রহীতারা বিশেষ করে ওষুধ কোম্পানিগুলো অনেকসময়ই প্রয়োজনীয় (ওষুধ অনুমোদন ও বাতিল সংক্রান্ত

তথ্য, কারখানা পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য, কমিটিতে বিভিন্ন আবেদনের অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি) ও হালনাগাদ তথ্যপ্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়।

৩.৬ কর্মবণ্টনে স্বচ্ছতার ঘাটতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্য-নির্বাহী প্রধান হচ্ছেন মহা-পরিচালক। মহা-পরিচালকসহ ৪জন পরিচালকের নেতৃত্বে ৩৭০ জনবল কাঠামো দ্বারা ওষুধ প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টনের কাঠামো তৈরি করা হলেও এখনো তা কার্যকর করা হয়নি এবং এক্ষেত্রে অত্র অধিদপ্তরে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালক বা মহাপরিচালক তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ বিভাজন করে থাকে। কর্মবণ্টনে স্বচ্ছতার ঘাটতির কারণে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরে কোম্পানি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণে অনিয়ম লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু কর্মকর্তা তাদের পছন্দ অনুযায়ী অর্থাৎ সুইট অক্ষর দ্বারা কোম্পানি নির্বাচন করে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় ও ছোট কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণে প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও যোগসাজশ হয়ে থাকে। আবার কিছু ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক তাদের পছন্দনীয় কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের জন্যও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এর ফলে সমঝোতামূলক দুর্নীতির সূযোগ সৃষ্টি ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ঝুঁকি তৈরি হয়। সার্বিকভাবে এ ধরনের ব্যবস্থা চালু থাকায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের জবাবদিহি ব্যবস্থা দুর্বল হয় এবং দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৩.৭ কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতার ঘাটতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে বিভিন্ন সময়ে পরিচালক এবং মহাপরিচালক কর্তৃক ইচ্ছানুযায়ী কর্মবন্টন ব্যবস্থা চালু থাকায় কর্মী ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর ফলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ওষুধ তত্ত্বাবধায়কদের নিয়মিত মনিটরিং ও জবাবদিহিতা কাঠামো অনেকসময় অকার্যকর হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ে নিয়ম অনুযায়ী সপ্তাহের পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে নূন্যতম দুই দিন পরিদর্শনে যাওয়ার বিধান থাকলেও সকলক্ষেত্রে তা পালন করা হয় না এবং কিছু ওষুধ তত্ত্বধায়ক নিয়মিত দোকান পরিদর্শন না করে রিপোর্ট প্রদান করে। আবার মাঠ পর্যায়ের কোনো কোনো তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক নিজ কর্মস্থলে নিয়মিত উপস্থিত না থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ ও প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন করার অভিযোগ রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ বিষয়ে জ্ঞাত থাকলেও দুর্বল জবাবদিহি কাঠামোর কারনে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। অপরদিকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কিছু কর্মকর্তা সরকারী চাকুরীর নিয়ম ভঙ্গ করে কোনো কোনো কোম্পানির পরামর্শক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত কোম্পানীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশাসনিক প্রভাব বিস্তার করে। আবার এ ধরণের কোম্পানির কোনো কার্যক্রম আইন বিরোধী হলেও কর্মকর্তাদের প্রভাবে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। পরামর্শক হিসেবে এ ধরণের অনৈতিক দায়িত্ব পালন করায় কিছু সৎ ও উদ্যমী কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ ও দায়িত্ব পালনে অনীহা তৈরি হয় এবং সর্বোপরি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরীবিক্ষণ ও জবাবদিহি কাঠামো দুর্বল করে।

৩.৮ নিজস্ব আইনজীবী না থাকা এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে প্রভাব বিস্তার

ওষুধ আইনের বিধান লঙ্ঘনজনিত মামলা পরিচালনার জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নেই। এক্ষেত্রে ওষুধ তত্ত্বাবধায়কদের কোর্টে মামলা করার পর পিপি'র (পাবলিক প্রসিকিউটর) ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু অনেকসময় দেখা যায় মামলার মধ্যবর্তী পর্যায়ে পিপি পরিবর্তন হয় এবং এরফলে মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে পিপি নানা ধরণের সরকারি মামলা পরিচালনায় ব্যস্ত থাকার কারণে তার পক্ষে গুরুত্ব সহকারে যুক্তি তর্ক উপস্থাপন সম্ভব হয় না। এর ফলে তিনি বিবাদী পক্ষের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাদার আইনজীবীর সাথে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনে সফল হতে পারে না এবং সার্বিকভাবে ওষুধ আইনের বিধান লঙ্ঘনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না এবং অপরাধ করার পরও ছাড়া পেয়ে যায়। আবার আাইনি ব্যবস্থা গ্রহণ ও মামলা পরিচালনা কার্যক্রমে ওষুধ তত্ত্বাবধায়কদের ওপর স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী সংগঠন প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাদেরকে অনেকসময় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গেলে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। কিছুসংখ্যক ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক এ সকল ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমঝোতামূলক অনিয়ম ও দুর্নীতিতে যোগসাজশ করে থাকে।

৩.৯ ওষুধ আদালতে মামলা নিস্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা

ওষুধ আইনের বিধান লঙ্ঘনজনিত অপরাধের মামলা নিস্পত্তির ক্ষেত্রে ওষুধ আদালত বা নিম্ন আদালতে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়। সাধারণত ওষুধ পরিদর্শক বা তত্ত্বাবধায়করা ওষুধ আদালতে মামলা করার পর সংশ্লিষ্ট কোর্ট বিবাদী পক্ষ বা আসামিকে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। এক্ষেত্রে আসামি সশরীরে কোর্টে হাজির হয়ে অথবা তার পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবী নির্দিষ্ট সময় চেয়ে আবেদন করে। নিম্ন আদালত হতে প্রাপ্ত এ সুযোগ বা প্রদত্ত সময়ের তোয়াক্কা না করে প্রায়শ বিবাদী ওষুধ কোম্পানিগুলো উচ্চ আদালতে সংবিধানের ৪০নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা ক্ষুন্ন

হয়েছে দাবি করে বাদী পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এক্ষেত্রে উচ্চ আদালত বিষয়টিকে আমলে নিয়ে নিম্ন আদালতকে কারণদর্শাও নোটিশ প্রদান করে এবং উচ্চ আদালতের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত নিম্ন আদালতের সংশ্লিষ্ট মামলা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখে। বিবাদী পক্ষের এ মামলার প্রেক্ষিতে নিম্ন আদালতের কার্যক্রম অনেকসময়ই দীর্ঘসময় ধরে স্থগিত থাকে। অপরদিকে অনেকসময় উচ্চ আদালত রুলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাদিপক্ষ কর্তৃক অভিযুক্ত কোম্পানি পরিদর্শনসহ নমুনা সংগ্রহের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখে। এর ফলে দেখা যায় অভিযুক্ত কোম্পানি বা ব্যক্তি আদালতে মামলা অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায়ও নিম্নমানের ওষুধ উৎপাদন অব্যহত রাখে।

৩.১০ ওষুধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর কার্যকরতার ঘাটতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওষুধ সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১০টি কমিটি সহায়তা প্রদান করে। এই কমিটিগুলো মূলত ওষুধ খাতের নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন বিষয়ের কার্যকর ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোর কার্যকরতার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা লক্ষণীয়। এগুলো হল- নতুন পুন:গঠিত অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়েকশন অ্যাডভাইজরী কমিটি ব্যতীত বাকি কমিটিগুলোর সভা অনুষ্ঠানের সময়কাল ও বাধ্যবাধকতা উল্লেখ না করা, কমিটিগুলোর গঠন প্রক্রিয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইড লাইন অনুসরণ না করা, কমিটিগুলোতে ওষুধ শিল্প সমিতির প্রতিনিধিদের আধিপত্য বিস্তার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন সদস্যের অভাব এবং সভায় কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতার অভাব উল্লেখযোগ্য। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় একটি কমিটি ব্যতিত সবগুলোতেই ওষুধ শিল্প সমিতির প্রতিনিধিদের আধিপত্য রয়েছে। কমিটিগুলোতে শিল্প সমিতির আধিপত্য থাকায় সদস্যদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব কাজ করে। অনেকসময় দেখা যায় সংশ্লিষ্ট কোম্পানির মালিকই সদস্য হিসেবে তার কোম্পানির ওষুধের দাম নির্ধারনে ভূমিকা রাখে। অপরদিকে কমিটিগুলোতে প্রথম শ্রেণীর খ্যাতনামা বড় কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিত্ব বেশি থাকে, এ ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণ, কাঁচামাল আমদানি অথবা প্রকল্প মূল্যায়ণ সবক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকে যা কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন অংশিদারিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যহত করে। কমিটিগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেকক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কমিটি সদস্য নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কিত কোম্পানির ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করার প্রবণতা থাকে। ফলে কোন নতুন প্রকল্প অনুমোদনে বা যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং তা বাস্তবায়নে কমিটির অন্য সদস্যদের প্রভাবিত করা হয়।

৩.১১ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার ঘাটতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার ঘাটতি লক্ষণীয়। ওষুধ শিল্পের ব্যবস্থাপনা ও বিকাশে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে এটি একটি গুরত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানটিতে দীর্ঘদিন ধরে জনবল ও অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। মুখ্যতথ্যদাতাদের মতে, সত্যিকার অর্থে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে জনবল সংক্রান্ত ঘাটতি ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা গত দুই দশক ধরে অমীমাংসিত অবস্থায় থাকতো না। পরিদপ্তর হতে অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ার পর চার বছর অতিবাহিত হলেও এখনো পর্যন্ত অনুমোদিত জনবলের ৩৮ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। অপরদিকে কাজের পরিধি ও ওষুধের বাজারের বিস্তৃতি বিবেচনায় ২০১০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক একটি মূল্যায়নে ৯৪৭টি পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে এটি উপেক্ষিত হয়। উপরন্তু অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ার সময় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে ৫৭০টি পদের চাহিদাও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে উপেক্ষিত হয়। জনবল সমস্যা উপেক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট অংশিজনের অনেকেই নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের সদিচ্ছার ঘাটতিকে দায়ী করেন। এছাড়া ওষুধ পরীক্ষাগারের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দ এখনও পর্যন্ত জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের আওতায় রাখা হয়েছে, অথচ এটি বর্তমানে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাধীন রয়েছে। এর ফলে বর্তমানে ওষুধ পরীক্ষাগারের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী রিএজেন্ট ক্রয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এছাড়া এ অধিদপ্তরের বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুমোদিত বাজেটের গড়ে মাত্র ০.১৮ শতাংশ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের জন্য ব্যয় করা হয় এবং এ বাজেটের বেশিরভাগই খরচ হয় অনুন্নয়ন ব্যয়ে। কিন্তু উন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ কম। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে এই অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা আনয়নে একটি বড় অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অপরদিকে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে বিদ্যমান আইনসমূহে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। এছাড়া বর্তমান আইন দু'টি সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ঠ নয়। কিন্তু এ বিষয়ে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের অভাব রয়েছে। এক্ষত্রে ১৯৪০ সালের ওষুধ আইনের বিধিমালা হালনাগাদ না করা এবং ১৯৮২ সালের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের বিধিমালা তৈরি না করা লক্ষণীয়। ঔষধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সবগুলো কমিটিতেই (বিশেষত: প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি, ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটি, মূল্য নির্ধারণ কমিটি, ড্রাগ কন্ট্রোল টেকনিক্যাল সাব কমিটি) নীতি-নির্ধারণী পর্যায় হতে ওষুধ শিল্প সমিতির এক বা একাধিক প্রতিনিধি রাখা হয়েছে। পূর্বে কোনো কমিটিতে ওষুধ শিল্প সমিতির এত বেশি প্রতিনিধি ছিল না, কারণ এতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। এক কোম্পানির মালিক আরেকটি কোম্পানির প্রকল্প মূল্যায়ন করছে কিন্তু তারা ওষুধের বাজারে একে অপরের

প্রতিযোগী। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটিতে কিছু ওষুধ কোম্পানির প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অনৈতিক প্রভাব ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

৪. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণ

৪.১ ওষুধ কারখানার লাইসেন্স প্রদান

প্রকল্পের লাইসেন্স অনুমোদনে অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষণীয়। মূল্যায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা আহ্বানে ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপন করা এবং আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা ব্যক্তির প্রকল্প দ্রুত কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া প্রকল্প অনুমোদনে কমিটির কিছু সদস্যদের মধ্যে সিন্ডিকেট গঠনের অভিযোগ লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে কমিটির কিছু সদস্য কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূত অর্থ ও উপঢৌকন গ্রহণ করে প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অপরদিকে প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমাদনের পূর্বে প্রকল্প পরিদর্শনে অনিয়ম ও দুর্নীতির যোগসাজস হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কারখানায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অর্ধেক পূরণ না হলেও অনুমোদন প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য অধিদপ্তরের কিছুসংখ্যক কর্মকতা সরকারি চাকুরি বিধি লঙ্ঘন করে কোম্পানিগুলোতে পরামর্শক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করে থাকে। এ কারণে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কোন প্রকল্পের লাইসেন্স অনুমোদন করার বিষয় উত্থাপিত হলে তাদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব কাজ করে।

৪.২ রেসিপি অনুমোদন

রেসিপি অনুমোদনের ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মকর্তা ও কিছু ওষুধ কোম্পানির অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষণীয়। অধিদপ্তর কর্তৃক রেসিপির উপাদান সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে যাচাই না করাএবং এ সুযোগে কিছু কোম্পানি কর্তৃক বেশি লাভের আশায় অনুমোদিত রেসিপির উপাদানে পরিবর্তন করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া রেসিপি কমিটির সভা আহ্বানে অর্থিক লেনদেন না হলে সভা আহ্বানে কালক্ষেপনের অভিযোগও পাওয়া যায়। সাধারণত রেসিপি অনুমোদনের সভা আহ্বানসহ এ সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনে একজন দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকলেও সকলক্ষেত্রে এ নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। এক্ষেত্রে কিছু প্রভাবশালী কর্মকর্তা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ প্রাপ্ত পরিচালক বা মহাপরিচালককে প্রভাবিত করে এ সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৩ ওষুধ নিবন্ধন

ওষুধ নিবন্ধনে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং কোম্পানির যোগসাজশে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়ে থাকে। অনেকক্ষেত্রে ওষুধ কারখানাগুলোর সংযুক্তিতে নির্দেশিত ওষুধ সঠিকভাবে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকা সত্ত্বেও কিছু পরিদর্শক কর্তৃক কোম্পানির সাথে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে এ বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং ওষুধের নিবন্ধন দেওয়া হয়। অপরদিকে ওষুধের নাম অনুমোদনেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপনের অভিযোগ লক্ষণীয়। ওষুধের সংখ্যাভেদে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ওষুধের অনুমোদন দেওয়া হয়। আবার নতুন ওষুধের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো অনুমোদনহীন ওষুধ উৎপাদন করে থাকে। এক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসনের কোনো কোনো কর্মকর্তার যোগসাজশে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়।

৪.৪ ওষুধের ফয়েল, ইনসার্ট, লেবেল এবং মোড়ক অনুমোদন

ওষুধের ফয়েল, লেবেল, ইনসার্ট এবং মোড়ক অনুমোদনে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি যেমন- ওষুধের বাণিজ্যিক ও জেনেরিক নাম, উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার তারিখ, ওষুধের উপাদান, সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ডোজের পরিমাণ ইত্যাদি সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করা হয় না। এ সুযোগে কিছু স্থানীয় ও ছোট কোম্পানি খ্যাতনামা বড় কোম্পানিগুলোর বাণিজ্যিক নাম ও মোড়কের ডিজাইন নকল করে থাকে। ওষুধ আইন অনুযায়ী ওষুধের বাণিজ্যিক নাম, মোড়কের ডিজাইন কোম্পানিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কথা কিন্তু অনুমোদনের সময় কিছু ওষুধ কোম্পানি ওষুধ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার যোগসাজশে এই নিয়ম না মেনেই ঘুষের বিনিময়ে অনুমোদন নিয়ে থাকে। আবার অনেকক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে এ সংশ্লিষ্ট ছাড়পত্রের আবেদনকৃত ফাইল আটকে রাখে এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ দাবি করে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলো তাদের প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনায় সমঝোতামূলক দুর্নীতির আশ্রয় নেয়।

৪.৫ ব্লকলিস্টের অনুমোদন

ব্লকলিস্ট অনুমোদনে নিযুক্ত কিছু কর্মকর্তা অনেক সময়ই ব্লকলিস্টে উল্লেখিত মালামাল সঠিকভাবে আমদানি করছে কিনা এবং বছর শেষে আমদানিকৃত মালের হিসাব প্রদান করছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো ঠিকমতো যাচাই বাছাই না করে সমঝোতামূলক দুর্নীতির মাধ্যমে প্রাথমিক অনুমোদন দিয়ে থাকে। আবার ব্লক লিস্ট অনুমোদনে কমিটির কিছু সদস্যদের সাথে কোম্পানিগুলোর যোগসাজশ সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্লক লিস্টের অনুমোদন প্রাপ্তিতে সাহায্য করে। এ সুযোগে

আমদানিকারকরা অনেকসময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কিছু আমদানিকারক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত কাঁচামাল বাইরে খোলা বাজারে বিক্রি করে থাকে। ব্লকলিস্টের মাধ্যমে আমদানিকৃত কাঁচামাল শুধুমাত্র আমদানিকারক কর্তৃক প্রদত্ত বিল অফ এন্ট্রির তথ্যের ভিত্তিতে ওষুধ প্রশাসন তাদের তদারকি কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং ছাড়পত্র প্রদান করে। কিন্তু আমদানিকৃত কাঁচামালের গুণগত মানের তদারকি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কোন প্রকার ভূমিকা পালন করে না।

৪.৬ ওষুধের লিটারেচার অনুমোদন

ওষুধের লিটারেচার অনুমোদনে অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষণীয়। কিছু কোম্পানি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওষুধের লিটারেচারে অতিরিক্ত বিভিন্ন উপাদান বা উপকারিতার কথা উল্লেখ করে থাকে যা উক্ত ওষুধের জন্য প্রযোজ্য বা সামঞ্জস্য নয়। তথাপি ওষুধ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশে এ ধরনের লিটারেচার অনুমোদন দেওয়া হয়। আবার কোনো কোনো কোম্পানি ওষুধ প্রশাসন থেকে লিটারেচারের অনুমোদন না নিয়েই ওষুধ বাজারজাত করে থাকে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অনেক ক্ষেত্রে তা জানলেও অবৈধ অর্থের লেনদেনের কারণে তা এড়িয়ে যায়।

৪.৭ ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ ও নমুনা পরীক্ষা

ওষুধের নমুনা পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবায় বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম ও দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। ওষুধ কোম্পানিগুলোর বাজারজাতকৃত ওষুধ থেকে ব্যাচ অনুযায়ী দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করে ওষুধ পরীক্ষাগারে পাঠানোর নিয়ম থাকলেও অনেকক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয় না। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মকর্তা ওষুধের মান পরীক্ষা না করে সমঝোতামূলক দুর্নীতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ওষুধের ছাড়পত্র প্রদান করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কিছু ছোট ও স্থানীয় ওষুধ কোম্পানির নিজস্ব পরীক্ষাগারে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা না থাকায় তাদের উৎপাদিত ওষুধের মান পরীক্ষা অধিদপ্তরের পরীক্ষাগারে সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় জনবল, যন্ত্রপাতি এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যবস্থার অভাব থাকার কারণে এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী অনিয়মের সুযোগ গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর সাথে যোগ সাজশে ওষুধের মান পরীক্ষায় মিথ্যা তথ্য প্রদান করে ছাড়পত্র দিয়ে থাকে। ওষুধ উৎপাদনের পর তার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে ওষুধ প্রশাসন হতে নিয়মিতভাবে তদারকির অভাব লক্ষণীয়। গবেষণায় পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বেশিরভাগ কোম্পানিরই বিশেষ করে ছোট কোম্পানিগুলোর উৎপাদিত ওষুধ ও এর কাঁচামাল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই। ছোট কোম্পানিগুলোর এ ধরণের অনিয়ম ওষুধ প্রশাসন হতে নিয়মিতভাবে তদারকি করা হয় না। তাছাড়া ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের এ ধরণের অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম ঢাকার জন্য সংশ্লিষ্ট ওষুধ তত্ত্বাবধায়ককে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে। এছাড়া আইনানুযায়ী ওষুধে ব্যবহৃত উপাদান অবশ্যই ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া, অথবা ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিক্যাল কোডেক্স অথবা ইউনাইটেড স্টেটস ফার্মাকোপিয়ার যে কোন প্রবন্ধে উল্লেখ থাকতে হবে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ওষুধের উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয় না অথচ ওষুধের ফয়েলে ওষুধের মান চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বিপি, ইউএসপি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এ সকল বিষয়ে ছাড়পত্র প্রদানে পূর্বে সঠিক ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে না যা এ অনিয়মকে সাধারণ বাস্তবতায় পরিণত করেছে।

৪.৮ ওষুধের মূল্য নির্ধারণ

ওষুধের মূল্য নির্ধারণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ক্ষমতা মূলত কাগজেকলমে বিদ্যমান। ওষুধ কোম্পানিগুলোই মূলত তাদের উৎপাদিত ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করে। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর শুধুমাত্র ১১৭টি অত্যাবশকীয় ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে যদিও এর মধ্যে অনেক ওষুধই বর্তমানে উৎপাদিত হয় না। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০১ সালের পূর্বে ওষুধের মূল্য নির্ধারণে ওষুধ প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে ওষুধ প্রশাসন নামমাত্র ভূমিকা পালন করে এবং কোম্পানিগুলো নিজস্ব তত্ত্বাবধায়নে ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করে এবং ওষুধের মূল্য নির্ধারণ কমিটির মাধ্যমে তা অনুমোদন করিয়ে নেয়। কোম্পানিগুলো তাদের উৎপাদিত ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করে ওষুধ প্রশাসনে নিবন্ধনের জন্য জমা দেয় এবং ওষুধ প্রশাসনের এ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা শুধুমাত্র নিয়মানুযায়ী ভ্যাট সংযোগ করে মূল্য নির্ধারণ কমিটিতে তা পর্যালোচনার জন্য জমা দেয়। আমদানীকৃত ওষুধের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসন ও আমদানীকারকদের মধ্যে অনিয়ম ও দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমদানিকারকদের মধ্যে কেউ কেউ ওষুধ প্রশাসনের মূল্য নির্ধারণ কমিটির সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এর ফলে ওষুধের দাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তাদের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা থাকে এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যদেরকে আমদানিকারক দ্বারা প্রভাবিত হতে হয়। এছাড়া আমদানিকারকরা ওষুধ প্রশাসনে আমদানীকৃত ওষুধের ক্রয়মূল্য দাখিল করার সময় সংশ্লিষ্ট বিদেশী কোম্পানির সাথে যোগসাজশে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দেখিয়ে থাকে। ওষুধ প্রশাসন হতে ঠিকমতো তদারকি না করা এবং তদারকির ক্ষেত্রে অদক্ষতার কারণে বেশি মূল্য দেখিয়ে অনেক সময় মূল্য অনুমোদন হয়ে থাকে।

৪.৯ গুড ম্যানুফেকচারিং প্রাকটিস (জিএমপি) সনদ

ওষুধ কোম্পানিগুলোর গুড ম্যুফেকচারিং প্রাকটিস অনুসরণের বিষয়টি ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে পরিবীক্ষণ সাপেক্ষে সনদ প্রদান করা হয়। ওষুধ প্রশাসন হতে কোম্পানিগুলোকে এই বিষয়ে একটি গাইডলাইন সরবরাহ করার নিয়ম থাকলেও পর্যবেক্ষণে দেখা যায় স্থানীয় ছোট কোম্পানিগুলোকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অধিদপ্তর হতে এ গাইডলাইন সরবরাহ করা হয় না। আবার দেখা যায় ওষুধ প্রশাসন হতে এ সকল তথ্যাদি অনুসরণ করার কথা বলা হলেও বেশকিছু কোম্পানি বেশি মুনাফা লাভের আশায় তা অনুসরণ করে না। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এক্ষেত্রে তাদের তদারকির দায়িত্ব ঠিকমত পালন করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কোম্পানি পরিদর্শণ না করে অথবা পরিদর্শনকালীন নানা ধরনের অনিয়ম পাওয়া সত্ত্বেও জিএমপি সনদ প্রদান করে। বিশ্বব্যাংক এর একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশে জিএমপি সনদ প্রদানে ওষুধ প্রশাসনের দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের অদক্ষতা এবং রাজনৈতিক চাপ উল্লেখ করা হয়।

৪.১০ নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি)

সাধারণত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বা গবেষণা কাজে বিদেশি ওষুধ ও ওষুধ দ্রব্যাদি স্বল্প পরিমানে আমদানির ক্ষেত্রে এনওসি'র নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এ নিয়ম লঙ্ঘন করে করে ওষুধ প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তার যোগসাজশে কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমদানি করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া এনওসি অনুমোদন ওষুধ প্রশাসনের কিছু প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা লক্ষণীয়।

৪.১১ ড্রাগ লাইসেন্স (খুচরা ও পাইকারী ওষুধ দোকান)

ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যুকরণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ লক্ষণীয়। বর্তমানে সারাদেশে এক লক্ষ বার হাজার দুইশত আঠারটি খুচরা ও পাইকারি ওষুধের দোকান রয়েছে। ড্রাগ লাইসেন্স আবেদনে নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অথবা ড্রাগ স্টোরের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তির অবশ্যই 'সি গ্রেড' এর ফার্মেসী কোর্স এর সার্টিফিকেট থাকতে হবে। এই হিসেবে সারাদেশে 'সি গ্রেডের' ফার্মাসিস্টের সংখ্যাও দোকানের সংখ্যা সমপরিমান হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে রেজিস্ট্রেশনধারী সি গ্রেডের ফার্মাসিস্ট এর সংখ্যা হচ্ছে ঊনসত্তর হাজার ছয়শত আটচল্লিশ (১৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের তথ্য)। বিগত ২০০১-২০০৪ সালে ওষুধ প্রশাসন হতে সারা দেশে প্রায় ২৫-৩০ হাজার নতুন ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। উল্লেখিত বছরগুলোতে মূলত: একই ফার্মাসিস্ট এর রেজিস্ট্রেশন ২/৩ বার দেখিয়ে এবং এক জেলার ফার্মাসিস্ট এর রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে অন্যান্য জেলায় লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে নতুন ড্রাগ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হলে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার ওষুধ তত্ত্বাবধায়ককে সংশ্লিষ্ট দোকান পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যাচাই করে জেলা ড্রাগ লাইসেন্স কমিটিতে উপস্থাপন করতে হয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করেই দোকানদারের সাথে যোগসাজশে প্রাথমিক অনুমোদন দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নতুন লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নে নির্ধারিত ফি ছাড়াও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়।

ওষুধের দোকান পরিবীক্ষণ ও তদারকির ক্ষেত্রে ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক ও ওষুধের দোকানদারদের মধ্যে দুর্নীতির যোগসাজশ লক্ষণীয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ওষুধের দোকান পরিবীক্ষণ ও তদারকিতে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ না করে ওষুধের দোকান থেকে অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের ক্ষেত্রে নিয়মাবলী ও শর্তসমূহ শিথিল করে থাকে। মূলত এ অনিয়মের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতামূলক দুর্নীতি কাজ করে থাকে।

৫. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তদারকির ঘাটতি ও ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুষ্ঠু তদারকির ঘাটতির কারণে কিছু ওষুধ কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ লক্ষণীয়। কিছু ওষুধ কোম্পানি দেশে ও বিদেশে ওষুধ বিপণনে তাদের উৎপাদিত ওষুধে ব্যবহৃত কাঁচামালের দাম ও গুণগত মানের ভিন্নতার অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে বিদেশে রপ্তানিতে তারা উন্নতমানের কাঁচামালের ব্যবহার ও স্থানীয় বাজারে বিপণনের জন্য নিম্নমানের মানের কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে। আবার কিছু কোম্পানি কর্তৃক ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ বিচ্ছিন্ন করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া কিছু কোম্পানি কর্তৃক ওষুধ তৈরিতে বিভিন্ন ফার্মাকোপিয়া অনুসরণ না করা সত্ত্বেও ওষুধের ফয়েলে বিপি, ইউএসপি উল্লেখ করার অভিযোগ পাওয়া যায়। ওষুধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটিতে বিশেষত: ব্লকলিস্ট অনুমোদন কমিটি এবং মূল্য নির্ধারণ কমিটিতে কিছু প্রভাবশালী কোম্পানির সদস্য কর্তৃক নিজ কোম্পানিসহ অন্য কোম্পানির ওষুধের ব্লকলিস্ট অনুমোদনে প্রভাব বিস্তার এবং মূল্য নির্ধারণে কিছু ওষুধ কোম্পানির মালিকদের শক্তিশালী ভূমিকা এবং অনৈতিক প্রভাব লক্ষণীয়। এর ফলে দেখা যায় কিছু কোম্পানি কর্তৃক জোটবদ্ধ হয়ে কিছু ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আইন অনুযায়ী ওষুধের মোড়কে উৎপাদন কারখানার নাম ও অবস্থান উল্লেখ করার বিধান থাকলেও কিছু দেশি ও বিদেশি কোম্পানি

কর্তৃক ক্ষেত্রবিশেষে তা উল্লেখ না করার অভিযোগ পাওয়া যায়। আবার কিছু ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক ওষুধের রেজিস্ট্রেশন ও মূল্য অনুমোদনের পূর্বেই বাজারজাত করার অভিযোগ রয়েছে।

৬. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

সেবার ধরন	নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ
নতুন লাইসেন্স প্রদান (অ্যালোপ্যাথিক)	৫ - ১০ লক্ষ
লাইসেন্স নবায়ন	৫০ হাজার- ১ লক্ষ
প্রকল্প হস্তান্তর/স্থানান্তর	১০ - ১৫ লক্ষ
রেসিপি অনুমোদন	৪ - ৫ হাজার (রেসিপি প্রতি)
ওষুধ নিবন্ধন	১ - ১.৫ লক্ষ
ফয়েল, ইনসার্ট, লেবেল অনুমোদন	৭ - ৯ হাজার (খসড়া ও চূড়ান্ত)
ব্লকলিস্ট অনুমোদন	২ - ২.৫ হাজার (পেজ প্রতি)
লিটারেচার অনুমোদন	৪- ৫ হাজার (প্রডাক্ট প্রতি)
মূল্য নির্ধারণ	৫ - ৬ হাজার (প্রডাক্ট প্রতি)
ওষুধ রপ্তানির নিবন্ধন ও জিএমপি সনদ	২০ - ৩০ হাজার (উভয়ক্ষেত্রে)
নমুনা পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ	৬ - ৭ হাজার (নমুনা প্রতি)
ড্রাগ লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	১০ - ১৫ হাজার
ড্রাগ লাইসেন্স নবায়ন	৫ শত - ১ হাজার (নবায়ন)

সুতারাং পরিশেষে বলা যায়, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর তার কাজের পরিধি, ভৌগোলিক আওতা এবং ওষুধের বাজারের বিস্তৃতি বিবেচনায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সক্ষম নয়। এক্ষেত্রে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা যেমন- জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিকস এবং দক্ষতা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। এছাড়া ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইনি কাঠামো সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ট নয় এবং বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগের অভাব রয়েছে। অপরদিকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দায়িত্ব বন্টন না করা, কর্মবণ্টনে স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতায় ঘাটতি লক্ষণীয়। ওষুধ প্রশাসনের সেবা কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে মূলত সমঝোতামূলক দুর্নীতির মাধ্যমে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে এবং স্থানীয় ছোট কোম্পানিগুলো অধিক মাত্রায় সমঝোতামূলক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করছে। অপরদিকে ওষুধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের প্রভাব সমঝোতামূলক দুর্নীতিকে শক্তিশালী করছে। সার্বিকভাবে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সময়ে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চাহিদা অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি না করা, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস সুবিধা না বাড়ানো, পর্যাপ্ত বরাদ্দ বৃদ্ধি না করা, ওষুধ নিয়ন্ত্রণে সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইনি সংস্কার না করা উল্লেখযোগ্য।

৭. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

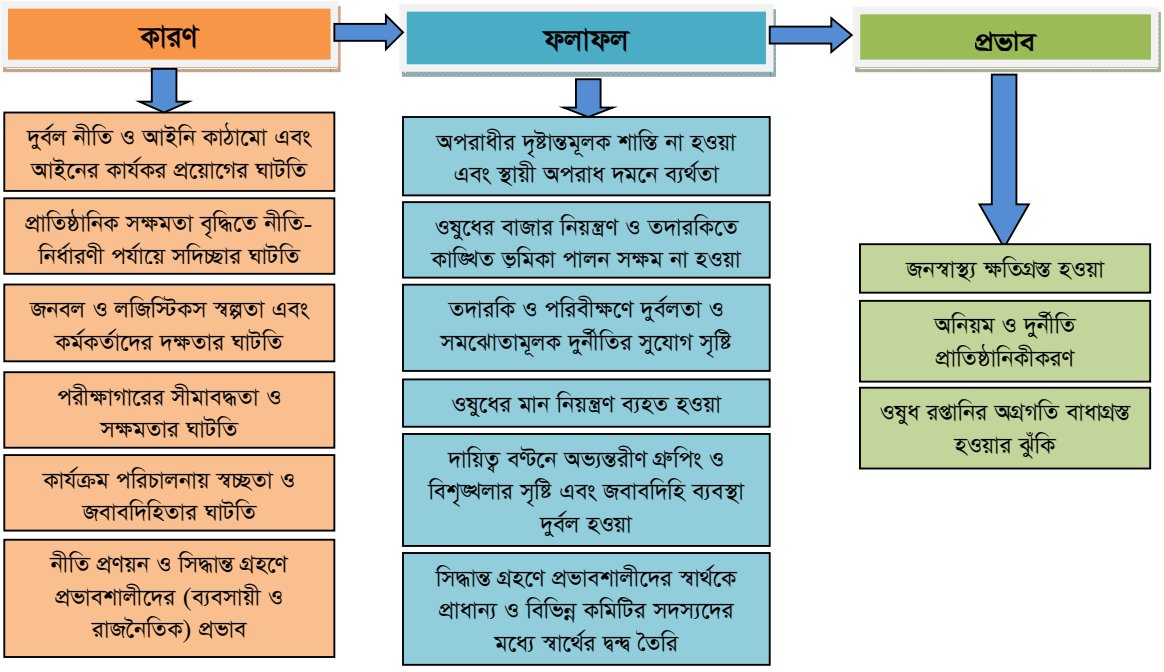

৮. সুপারিশ

এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও তদারকি ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও টেকসইকরণ এবং দুর্নীতি ও অনিয়মরোধে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রণয়ন করছে-

আইন ও নীতি সংক্রান্ত

১. একটি যুগোপযোগী নীতি কাঠামো তৈরি এবং ওষুধ আইন ১৯৪০ ও ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর নিম্নোক্ত সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় এনে একটি সমন্বিত একক আইন প্রণয়ন এবং এর কার্যকর প্রয়োগে পদক্ষেপ নিতে হবে

- আইনে মেডিকেল ডিভাইস, ফুড সাপ্লিমেন্ট ও কসমেটিকস সামগ্রী অন্তর্ভূক্ত করা
- ওষুধ সংক্রান্ত কমিটিগুলোর গঠন ও কর্ম প্রক্রিয়া আইনে অন্তভূক্ত ও সুনির্দিষ্ট করা
- ওষুধের মূল্য নির্ধারণে গেজেট প্রকাশের সময়কাল সুনির্দিষ্ট করা
- ওষুধ আইনে অপরাধের জরিমানা ও শাস্তির অসামঞ্জস্যতা দূর করে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত

২. কাজের পরিধি ও ভৌগলিক আওতা বিবেচণায় প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি ওষুধ পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি ও অতিসত্ত্বর অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সকল পর্যায়ে জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে

৩. প্রতিটি জেলায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অফিস স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস-আসবাবপত্র, কারিগরি সুবিধা এবং পরিদর্শনে পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে

৪. প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করে কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

৫. অর্গানোগ্রাম ও কর্ম-বিবরণ অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করতে হবে এবং ওষুধ কারখানা পরিবীক্ষণের দায়িত্ব বণ্টনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে

৬. অনলাইনভিত্তিক রিপোর্টিং চালু করতে হবে

৭. ওয়েবসাইটে সকল প্রকার রেজিস্ট্রেশনের তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে

৮. ওষুধ কোম্পানিগুলোর ওয়ানস্টপ ও অনলাইন ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম চালু করতে হবে

৯. ওষুধ প্রশাসনের কার্যক্রমে জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা- এ লক্ষ্যে টোল ফ্রি নম্বর বা হটলাইন চালু করতে হবে

অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধ সংক্রান্ত

১০. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য নৈতিক আচরণ বিধি তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে

১১. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে বিশেষত: ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটি, মূল্য নির্ধারণ কমিটি, ব্লকলিস্ট অনুমোদন কমিটি এবং প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের অর্ন্তভূক্তি বন্ধ করতে হবে

১২. যে সকল ওষুধ কোম্পানি নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুত করে তাদেরকে চিহ্নিত করে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে